তুমি কিভাবে প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করবে? ([redacted])

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী হয় তখন এ দেশে এক ধরণের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল, টোল, পাঠশালাগুলিতে প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম, দর্শন, তর্কবিদ্যা, প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করতেন। তবে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে ধর্মভিত্তিক গল্প, উপকথা ইত্যাদির প্রাধান্য ছিল। ছাত্রদের প্রায় সবাই ছিল ব্রাহ্মণ। তখন শিক্ষা দেওয়া হত কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায়। অন্য দিকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী ও ফার্সি ভাষা। এক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম, আরবী ও ফার্সি ভাষা। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম, ধর্মভিত্তিক আইন বা রীতি নীতি। তবে এগুলিতে আরবী ও ফার্সি জানা হিন্দু শিক্ষকরা ও নিযুক্ত থাকতেন। তখন সরকারি কাজে নিযুক্তির জন্য আরবী ও ফার্সি ভাষায় দক্ষতা আবশ্যিক ছিল। তাই বহু হিন্দু এই সব বিদ্যালয় আরবী ও ফার্সি চর্চা করতেন। তখন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা খুবই অবহেলিত ছিল এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন ভূগোল, অথতনীতি, গণিত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। স্বাভাবতই শিক্ষার মান ছিল খুবই পশ্চাদপদ এবং অনুপোযোগী। এটাই হলো প্রাচ্যবাদী ভাবধারা বা প্রাচ্যবাদ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন ক্ষমতা দখল করলেও এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ইংরেজদের এই উদাসীনতার দুটি মূল কারণ ছিল—(ক) ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মুনাফালব্ধ অর্থ ব্যয় করাকে কোম্পানি সম্পদের অপচয় বলে মনে করত; (খ) এক দল ইংরেজ প্রশাসক মনে করতেন যে, ধর্মকেন্দ্রিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার যা রূপান্তর ঘটল তা ভারতীয়দের কাছে ধর্মবিরোধী ও কৃষিবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে এবং ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হবে। ফলে প্রাথমিকভাবে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের মৌখিক বা আর্থিক অনুদান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকে। স্থানীয় জমিদারের সামান্য অনুদান এবং ছাত্রবৃন্দের 'দক্ষিণা'-র উপর নির্ভর করে এই সব বিদ্যালয়গুলি চলত। ক্রমে

দেশীয় শিল্পের বিনাশ এবং সরকারি দপ্তরে ভারতীয়দের নিয়োগ না করার নীতি কোনও মতে টিকে থাকা এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করে দেয়। বেলারী জেলার কালেক্টর ক্যাম্বেল রিপোর্টের উল্লেখ আছে।

সরকারি উদ্যোগে দেশীয় শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশ অবহেলিত হলেও উনবিংশ শতকের শুরুতে কিছু দূরদর্শী ইংরেজ প্রশাসক ও পন্ডিত দেশীয় শিক্ষার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। এদের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, তিনি নিজেও কিছু জানতেন এবং তার সঙ্গে কিছু প্রাচ্যবাদী ইংরেজকে তিনি সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন, যা তাঁর মধ্যে প্রাচ্যবাদী ভাবধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এইরকম প্রাচ্যবাদী পন্ডিত হিসাবে জোনাথন ডানকান, উইলিয়াম জোনস্ এবং চার্লস উইকিন্স এর নাম করা যায়।

হেস্টিংসের প্রাচ্যবাদী ভাবধারা সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের জন্ম দেয়নি। হেস্টিংস নিজেও কিছু প্রাচ্য ভাষা জানায় তাঁর পক্ষে প্রাচ্য ভাষা গড়ে তোলা সহজ হয়েছিল। একদল সংস্কৃতিবান ইংরেজ প্রশাসক গড়ে তেলার এবং ভারতীয়দের নিজ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার সাবধানী নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। গভর্নর জেনারেলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোনও দেশকে সুদক্ষভাবে শাসন করতে হলে সে দেশের ভাষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন—ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ হেস্টিংসকে প্রাচ্যবাদী করে তুলেছিল।

হেস্টিংসের উদ্যোগে কলিকাতায় একটি 'মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১০ বছর পরে বেনারসের প্রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান হিন্দু-সংস্কৃতির পীঠস্থান বেনারসে একটি 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে)। কিন্তু এই কাজের পিছনে হেস্টিংস বা ডানকানের প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ কিংবা ভারতবর্ষের ভাবজাগতিক পরিবর্তনের প্রেরণা ছিল—এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে তাঁরা এই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হেস্টিংস বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে সুদক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ইংরেজ প্রশাসকদের এ দেশীয় ভাষা ও সামাজিক রীতি নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলা দরকার। একইভাবে ইংরেজ বিচারকদের সহকারী হিসাবে এদেশীয় মুহুরীদের দেশীয় আইন কানুন, ভাষা ও রীতি নীতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ করা এবং দক্ষ শাসন ব্যবস্থার অন্যতম দম্ভ হিসাবে বিচার বিভাগকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ডানকানের প্রধান লক্ষ্য।

ডানকান ফার্সি ভাষায় কর্ণওয়ালিসের দোভাষী হিসাবে এবং রাজস্ব সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। ডানকানের উদ্যোগে হিন্দুদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক

কেন্দ্রবিন্দু বেনারসে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে একটি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডানকান এই শিক্ষাকেন্দ্রকে সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থানের পরিণত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা গোটা দেশে সুদক্ষ ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের সাহায্য করবেন। প্রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস আরবি ও ফার্সি শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচরপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্য সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। এখানে প্রাচ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। শাসকদের সামগ্রিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচ্যের কোনও বিষয় নিয়ে মৌলিক গবেষণার পরিবর্তে প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী সাহিত্যগুলিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করাই ছিল এই সংস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। জনৈক নামক এক ইংরেজ লেখক লিখেছিলেন যে, উইলিয়াম জোনস্ মনে করতেন যে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচ্য সংস্কৃতি চর্চার ফলে ইংরেজ প্রশাসকগণ অনাচার মুক্ত থাকবেন, তাদের নৈতিক উন্নতি ঘটবে এবং এ দেশের মানুষের সাথে এমন একটা একাত্মতা গড়ে উঠবে যা সুশাসন প্রবর্তনের সহায়ক হবে।

উইলিয়াম জোনস্ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত ইতিহাসের 'সুবর্ণযুগ'-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 'তৃতীয় বার্ষিক আলোচনায়' জোনস্ বলেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের শিল্পনৈপুণ্য, রণকৌশল, জ্ঞানচর্চা, প্রশাসনিক ও আইনি দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এইচ. টি. কোলব্রুক ছিলেন সে যুগের সম্ভব শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবাদী পণ্ডিত উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জাগরণের ভিত্তিস্থাপন তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। তিনি বৈদিক ভারতবর্ষ নিয়ে গবেষণা করে তাঁর মধ্যে সুবর্ণযুগের অধ্যায় খুঁজে পান। তিনি প্রাচীন সাহিত্য ও সূত্র উদ্ধৃত করে দেখান যে বিধবা মহিলাদের আত্মাহুতি (সতীদাহ) দেবার রীতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচ্যুতি ছাড়া কিছু নয়। বেদচর্চা করে তিনি আবিষ্কার করেন যে প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে একেশ্বরবাদী ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে একাধিক দেবতায় বিশ্বাস ও মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো হিন্দু সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে একটি মিনিট প্রকাশ করেন। এটিকে প্রথম সরকারি প্রাচ্যবাদী কর্মসূচী বা হয়। এই মিনিটের খসড়া তৈরি করেছিলেন

কোলব্রুক। এই মিনিটের মূল বিষয় ছিল, প্রাচীন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির চর্চার জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ইংরেজ শাসকেরা নদীয়া ও তিরহুতে দুটি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সভ্যতার নিজস্ব কাঠামোর মধ্যেই হিন্দুদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। নব নিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা, আইন, রীতি-নীতি, ভূগোল, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ছিল এই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত প্রাচ্যবাদী পন্ডিত এইচ. কোলব্রুক উইলিয়ম ফেরী, জন গিলক্রিস্ট প্রমুখ ইংরেজ এই কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পাশ্চাত্য মনে প্রাচ্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটান। প্রতিষ্ঠার পরের বছর থেকে ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও শাস্ত্রদের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়। সংস্কৃত সাহিত্য ধর্ম, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা পাঠদান করতেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রী হরি বিদ্যারত্ন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পন্ডিত ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়েলেসলী এই কলেজটিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে ডেভিড কফ্ উল্লেখ করেছেন। তবে বিলাতের পরিচালক সভার আপত্তির ফলে এই কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের হেইলবেরিতে ওই রকম একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের চেষ্টায় হিন্দু সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটে। কোলব্রুক, ফেরী প্রমুখ ইংরেজ পন্ডিত ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে উদার ও উন্নত জীবনবোধের অস্তিত্ব লক্ষ করেন ও প্রচার করেন। ফেরীর মুন্সী রামরাম বসু, বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বাংলা ব্যকরণ ও সাহিত্যের জগতকে সমৃদ্ধ করেন।

এই প্রাচ্যবাদী ভাবধারার আর এক জন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন এইচ. এইচ. উইলসন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজকে পুনরুজ্জীবিত করার কৃতিত্ব উইলসনের প্রাপ্য। তাঁর গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক হিন্দু রীতিনীতির সঙ্গে ইতিহাস সম্মত সনাতন প্রথাগুলির মধ্যে সংযোগ খুঁজে বের করা।

প্রাচ্যবাদী ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য সরকারি উদ্যোগের বাইরে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীরা। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ডাচ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে 'ব্যাপটিস্ট মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা নিজেদের

মুদ্রণ যন্ত্র বানিয়ে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন লেখা ছাপাতে আরম্ভ করেছিল। লর্ড ওয়েলেসলী প্রাচ্যবাদী ভাবধারা প্রচারের জন্য এদের সহায়তা নিয়েছিলেন। উইলিয়াম কেরী ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে রামায়ণের ইংরাজি অনুবাদ করেন।

খ্রিষ্টান মিশনারী ও সংস্কৃত পন্ডিতদের যৌথ উদ্যোগের ফলশ্রুতি হিসাবে সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী সমাজ, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃতিক ঘৃণার চোখে দেখবেন।